بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ই জুলাই, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ বাইশ রোযা অতিবাহিত হয়েছে বা হচ্ছে আর এভাবে আমরা রমযানের শেষ আশারা বা শেষ দশকে রয়েছি। মহানবী (সা.)-এর এক উক্তি অনুসারে আমরা খোদা তা'লার রহমত ও মাগফিরাতের দশক অতিক্রম করে এখন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাতা আশারা বা দশক অতিক্রম করছি। অতএব এটি খোদা তা'লার একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের এই সুযোগ দান করেছেন, কিন্তু এক মু'মিন যে খোদার সত্তায় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বনের চেষ্টা করে, যার হৃদয় খোদা-ভীতিতে পরিপূর্ণ থাকে, সে শুধু এটি নিয়ে আনন্দিত হতে পারে না যে, এদিনগুলো বা এই দশক যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অতিবাহিত করার সুযোগ দিয়েছেন তা আমার মুক্তির কারণ হয়েছে। এদিনগুলো নিঃসন্দেহে রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন, কিন্তু প্রশ্ন হলো, এদিনগুলোর কল্যাণরাজি সত্যিকার অর্থে আমরা লাভ করতে পেরেছি কি? আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ বা উক্তি নিঃশর্ত হয় না বরং এগুলো শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। অতএব এই দিনগুলোর রহমত থেকে অংশ পাওয়ার জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে আর এদিনগুলোতে আল্লাহ তা'লার মাগফিরাত বা ক্ষমা থেকে অংশ পাওয়ার জন্যও কিছু শর্ত আছে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যও কিছু শর্ত মেনে চলা আবশ্যক।

অতএব এসব বিষয় থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আমাদের সেসব বিষয় সন্ধান করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর ফযল এবং কৃপারাজিতে ধন্য হতে পারি। কোন কোন মুফাস্সির খোদা তা'লার রহমতের দু'টো প্রকারভেদের উল্লেখ করেন। প্রথম প্রকার রহমত বা করুণা খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ হয়ে থাকে। তা অর্জন বা লাভের জন্য মানুষ বিশেষ কোন চেষ্টা সাধনা করে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, খোদা তা'লার একথা বলা যে, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ, আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর আল্লাহ্ তা'লার এই রহমত হতে সকল মানুষ বা সকলেই অংশ লাভ করছে। কোন প্রকার সৎকর্ম ছাড়াই তারা সেই রহমত থেকে অংশ লাভ করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি এভাবে বলেছেন, এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, রহমত সার্বজনীন এবং ব্যাপক আর আল্লাহ্র ক্রোধ অর্থাৎ আদল (অন্যায়ের যথাযথ শাস্তি দেয়া) বিশেষ কোন কারণে জন্ম নেয়। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্য ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলেই কার্যকর হয়। আর এর জন্য প্রথমে ঐশী আইন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক আর সেই ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলে পাপ সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। এরপরেই খোদার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং স্বীয় দাবী পূরণ করতে চায়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা আপন বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং দয়া প্রদর্শন করেন। কিন্তু ঐশী আইন লঙ্ঘনের পর মানুষ যখন গযব বা শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয় তখন ছোট-খাটো ভুল-ভ্রান্তি তো আল্লাহ্ তা'লা সব সময় ক্ষমা করতে থাকেন কিন্তু মানুষ যখন চরমভাবে সীমা লঙ্ঘন করা আরম্ভ করে তখন খোদা তা'লার আদল বা ন্যায় বিচার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য স্বীয় রূপ প্রকাশ করে। কিন্তু সার্বজনীনভাবে খোদা তা'লার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কিন্তু অনেক সময় আদল বা ঐশী বিধান লঙ্ঘণের ফলাফল স্বরূপ শাস্তি পাওয়া আবশ্যক হয়ে থাকে কিন্তু তাসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা করুণাবশতঃ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এই অবস্থা মু'মিনদের সাজে না। প্রকৃত মু'মিনদের অবস্থান এবং মর্যাদাই ভিন্ন। কিন্তু যদি সত্যিকার অর্থে ঈমান থেকে থাকে তাহলে ঈমানের দাবী হলো, ঈমানী অবস্থাকে সোধরানো এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে খোদা তা'লার রহমত এবং করুণা সেই পাপকে ঢেকে রাখেন। শুধু সেটিই নয় যেমনটি আমি গত কোন খুতবায় বলেছিলাম, অনেক সময় মানুষ পাপে ধৃষ্ট হয়ে যায় আর একথা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমতের সমুদ্র অতি ব্যাপক তাই কোন চিন্তা নেই। এমন মন-মানসিকতা খোদা তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। খোদা তা'লার রহমত বা করুণা কীভাবে তাঁর ক্রোধকে ঢেকে রাখে বা পরিবেষ্টন করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

সর্তকবাণীতে আসলে কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। শুধু যা থাকে তাহলো খোদা তা'লা স্বীয় কুদ্দূসিয়্যত বা পবিত্রতার কারণে অপরাধীকে শাস্তি দিতে চান আর কখনও কখনও এই নিরিখে নিজ ইলহামপ্রাপ্ত বান্দাদের এ সম্পর্কে অবহিতও করেন, অর্থাৎ যাদের ওপর ইলহাম করেন অর্থাৎ মনোনীতদের ও নবীদের বলে দেন যে, অমুক ব্যক্তি ধৃষ্ট হয়ে উঠছে, আমি তাকে শাস্তি দিতে যাচ্ছি। কিন্তু এরপর কি পরিস্থিতি দাঁড়ায়? কিন্তু সেই প্রয়োজন দেখা দেয়া সত্ত্বেও অপরাধী ব্যক্তি যখন সত্যিকার অর্থে তওবা, ইস্তেগফার, আহাজারী ও আকুতি-মিনতি করে তখন খোদার করুণার দাবী তাঁর গযব বা ক্রোধের দাবীর ওপর প্রাধান্য লাভ করে। অনেক সময় সংবাদও এসে যায়, শাস্তির সিদ্ধান্তও হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় সে যদি তওবা করে, ইস্তেগফার করা অব্যাহত রাখে তাহলে শাস্তি এড়াতেও পারে। তিনি (আ.) আরো বলেন, অতএব ঐশী রহমতের দাবী শাস্তি বা ক্রোধের দাবীর ওপর ছেয়ে যায় আর সেই গযব বা ক্রোধকে নিজের মাঝে লুকিয়ে ফেলে, প্রচ্ছন্ন করে, পর্দাবৃত করে এবং আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন। আয়াত عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ এর অর্থ এটিই অর্থাৎ رحمتی سبقت غذبی এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর ছেয়ে গেছে। অতএব অপরাধীদেরও তওবা ও ইস্তেগফারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন। যারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যায় তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেন। তিনি (আ.) বলেন, এমন অপরাধীরাও যাদের জন্য শাস্তি আবশ্যকীয় বা অবধারিত

হয়ে যায় তারাও যখন বিগলিত চিত্তে ক্রন্দন ও আহাজারী করে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন বরং যেমনটি আমি বলেছি, অনেকের শাস্তি সম্পর্কে স্বীয় মনোনীতদের অবহিতও করেন কিন্তু তারপরও অপরাধীর বিগলিত চিত্তের ক্রন্দন, তার আহাজারি এবং ইস্তেগফার করা খোদার করুণাবারিকে আকর্ষণ করে।

যাহোক মু'মিনের এটি সাজে না যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার নিয়মকে লঙ্ঘন করবে বা নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এরপর আহাজারি করবে এরপর খোদার করুণা যাচনা করবে। মু'মিনদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। আর দ্বিতীয় প্রকার রহমত বা করুণা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। আর এর প্রতিশ্রুতি সৎকর্মশীলদের এবং তাক্বওয়ার পথে বিচরণকারীদের সাথে শর্তযুক্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার রহমত মুহসিন বা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী বা সাথে আছে।

মুহসিন শব্দের অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি যে অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাক্বওয়ার পথে বিচরণকারী, জ্ঞানী, সকল শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কাজ সমাপ্তকারী। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, খোদার রহমত তাদের সাথে যারা জেনেশুনে পাপ করে না, শাস্তির ভয়ে তারা পাপ করে না। যারা নিজেদের পাপের শাস্তির ভয়ে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকে, হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে। তারা এমন মানুষ যারা জেনেশুনে পাপ করে না বরং অজান্তে কোন পাপ হয়ে গেলেও তাক্বওয়ার সাথে তারা খোদা তা'লাকে ডাকে। তখন খোদা তা'লার রহমত তাদের ওপর বর্ষিত হয় এবং তাদের দোয়া গৃহীত হয়। এটি খোদা তা'লার এক বিশেষ কৃপা বা রহমত যে, তিনি দোয়া গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে কোন জোর খাটে না আর না কেউ কোন জোর করতে পারে যে, অবশ্য অবশ্যই তিনি আমাদের দোয়া গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার দয়া এবং করুণা মুহসেনীনদের সাথে রয়েছে, তাদের সাথে রয়েছে এবং তাদের ওপর নাযিল হয় যারা তাক্বওয়ার সাথে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে, তাদের সাথে রয়েছে যারা অন্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী।

অতএব যদি চান যে, দোয়া দোয়া গৃহীত হোক তাহলে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক আর মুহসিন শব্দের এই সকল অর্থ সামনে রেখে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক। অতএব এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। সাধারণ বা তুচ্ছ সৎকর্ম করে মানুষ মুহসিন হতে পারে না বরং এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার জন্য নিজেদের সৎকর্মকে উন্নত মানে পৌঁছানো আবশ্যক। মহানবী (সা.) মুহসিনের যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন সেটি যদি মানুষ দেখে তাহলে মানুষের ভয়ে কেঁপে উঠার কথা যে, আমাদের ইবাদতের অবস্থা কি এমন? আমরা যে কাজই করি প্রতিটি কাজের সময় আমাদের অবস্থা কি এমন হয় যেরূপ মহানবী (সা.) বলেছেন। আর সেই অবস্থা কি? মহানবী (সা.) বলেন, মুহসিন হলো সে যে প্রতিটি সৎকর্মের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, সে আল্লাহ্ তা'লাকে দেখছে। একথা তার দৃষ্টিতে রাখা চাই বা অন্ততঃপক্ষে এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে দেখছেন। আমাদের

ইবাদতের অবস্থাও যদি এমন হয় এবং আমাদের অন্যান্য কাজ করার সময়ও যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে অন্যায় কাজ কখনও হতেই পারে না, আমরা কখনও তাক্বওয়া থেকে বিচ্যুত হতেই পারি না, কখনও কারও সাথে মন্দ আচরণ করতেই পারি না, কখনও কারও অধিকার খর্ব করতেই পারি না বরং কারও ক্ষতি করা বা অধিকার পদদলিত করার কথা ভাবতেও পারি না। অতএব ইসলামী শিক্ষা বা আদেশ-নিষেধ তো এমন যে, যেদিক থেকেই এগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা আমল করা আরম্ভ করুন না কেন বা আল্লাহ্ তা'লার যেই নির্দেশকেই নিন না কেন বা তাঁর রসূল (সা.)-এর যে কোন উক্তি বা নির্দেশকেই দেখবেন, তা আমাদের সবাইকে ঘিরে একসাথে যেদিকে নিয়ে যাবে তা হলো হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান অর্থাৎ অধিকার প্রদানের দিকে পরিচালিত করবে। আমরা আকুল বাসনা রাখি যে, আমাদের দোয়াও গৃহীত হোক, আমরা খোদার রহমত বা করুণাবারিরও উত্তরাধিকারী হই, তাঁর করুণাবারি যেন আমাদের ওপরও বর্ষিত হয়; কিন্তু তা অর্জনের জন্য আমরা সেই মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করি না বা আমাদের বেশির ভাগ মানুষ করে না বা আমরা রীতিমত সেই চেষ্টা করি না যা একজন মু'মিনের করা উচিত। আমরা একথায় উৎফুল্ল হয়ে যাই যে, খোদা তা'লার রহমতের দশক আমরা অতিবাহিত করেছি কিন্তু আমরা ভাবি না যে, এই রহমত লাভের জন্য আমরা কি করেছি বা আমাদের কি করা উচিত ছিল। আমরা কি সেসব পাপী এবং অপরাধীর মতই সময় অতিবাহিত করেছি যারা সাময়িক আহাজারি করে খোদার রহমত লাভ করে সেই শাস্তি এড়াতে পেরেছে যা কারও কোন বিশেষ অপরাধ বা কতক অপরাধের কারণে নির্ধারিত ছিল, নাকি আমরা মুহসেনীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের জীবনকে সেভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করছি যারা তাক্বওয়ার ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার করে, যারা অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহারের স্থায়ী অঙ্গীকার করে, যারা রমযানকে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের স্থায়ী মাধ্যমে পরিণত করার চেষ্টা করে এবং পরিণত করে?

অতএব আমাদের এই রহমত এবং করুণাবারি আকর্ষণের চেষ্টা করা প্রয়োজন এবং করা উচিত যা আমাদের স্থায়ী সঙ্গী হবে। তা সাময়িকভাবে আমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এবং সময় কেটে যাওয়ার পর আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব; এমনটি যেন না হয়। এই একটি মাত্র শব্দ রহমতের মাধ্যমে মহানবী (সা.) আমাদের জীবনের জন্য কর্মপন্থার এক ভান্ডার রেখে গেছেন যে, রমযানের প্রথম দশ দিনে তোমরা এই রহমত সন্ধান কর আর যখন এই রহমত লাভ হয় তখন এই অঙ্গীকার কর যে, একে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেব। এক মু'মিনকে এই দশ দিনের তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণ তাকে পরবর্তী পথ দেখাবে। কিন্তু শয়তান যেহেতু প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের পিছু ধাওয়া করছে, যে নিজের কাজে রত, বিভ্রান্ত করার কাজে রত, পুণ্য থেকে বিচ্যুত করার কাজে রত তাই এই রহমত বা করুণা লাভের পর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য খোদার সাহায্যের প্রয়োজন। আর এই সাহায্য অর্জনের জন্য আমাদের কোন রীতি অবলম্বন করতে হবে? বলা হয়েছে পরের দশ দিন খোদার সাহায্য এবং শক্তি

যাচনা কর যেন তোমাদের কর্ম স্থায়ী কর্মে রূপ নেয় আর সেই শক্তি হলো, ইস্তেগফার। তিনি বলেন, দ্বিতীয় দশক হলো মাগফিরাতের আশারা। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আহাজারি বা আকুতি মিনতিকারীর পাপ ক্ষমা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় ক্ষমা বা মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করেন এবং তাদের ওপর রহমত বারি বর্ষণ করেন বা কৃপা করেন কিন্তু মু'মিন তারা যারা এই সাত্তারী এবং রহমতকে জীবনের অংশ এবং অঙ্গীভূত করে নেয়। যার বহিঃপ্রকাশ তাদের ইবাদতের মাধ্যমেও হয় এবং অন্যান্য কর্মের মাধ্যমেও হয় এবং স্থায়ী ইস্তেগফারের মাধ্যমে যেন হয় আর নিজেদের কর্মের ওপর দৃষ্টি রেখে যেন হয়। আর যখন এমন হবে তখন খোদার মাগফিরাত বা ক্ষমা আমাদেরকে পরিবেষ্টন করবে, তাঁর রহমতের দ্বার আমাদের জন্য ক্রমাগতভাবে উন্মোচিত হতে থাকবে। আর যখন এমন হবে তখন পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিকও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ক্রমাগতভাবে দিতে থাকবেন।

এক মু'মিনের জন্য মাগফিরাতের প্রকৃত মর্ম বা তত্ত্ব কী আর এটি লাভের উপায় কী আর কীভাবে ইস্তেগফার করা উচিত সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, ইস্তেগফারের প্রকৃত এবং সত্যিকার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই নিবেদন করা যে, মানবীয় কোন দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় আর আল্লাহ্ প্রকৃতিকে যেন স্বীয় শক্তিতে শক্তিমান করেন এবং স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের গন্ডিভুক্ত করেন। এই শব্দটি 'গাফার' থেকে উদ্ভূত যা ঢেকে দেয়া বা আবৃত করাকে বলা হয়। অতএব এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তি বলে ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে আবৃত করেন। ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে যেন তিনি ঢেকে দেন আর অবিরত ইস্তেগফারের ফলে আল্লাহ্ তা'লা ঢেকেও রাখেন। তিনি (আ.) বলেন, ইস্তেগফারের আসল এবং প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা তা'লা স্বীয় শক্তি বলে ইস্তেগফারকারীকে অর্থাৎ যে ইস্তেগফার করে তাকে প্রকৃতগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করা এবং স্বীয় শক্তি বলে তাকে শক্তি যোগানো, স্বীয় জ্ঞান বলে তাকে জ্ঞান দান করা এবং স্বীয় আলো থেকে আলো দান করা কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করে তার থেকে পৃথক হয়ে যাননি বরং তিনি যেভাবে মানুষের খালেক বা স্রষ্টা আর তার সকল আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তি-বৃত্তির স্রষ্টা একইভাবে তিনি মানুষের কাইয়্যুমও অর্থাৎ যা কিছু বানিয়েছেন তাকে স্বীয় বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে হিফাযতকারীও বটে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে সৃষ্টি করেছেন স্বীয় বিশেষ সমর্থনের মাধ্যমে তার সুরক্ষাও করেন কেননা তিনি কাইয়্যুমও। অতএব খোদা তা'লার নাম যেহেতু কাইয়্যুমও অর্থাৎ নিজ সাপোর্ট বা সমর্থনের মাধ্যমে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী তাই মানুষের জন্য আবশ্যক হলো যেভাবে সে খোদার খালিকিয়্যাতের কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে একইভাবে সে যেন স্বীয় সৃষ্টির ছাপকে আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়াতের মাধ্যমে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

অতএব মানুষের জন্য এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন ছিল যার কারণে ইস্তেগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়াত

থেকে অংশ লাভের জন্য, নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য কি করা উচিত? আল্লাহ্ তালা বলেন, ইস্তেগফার কর।

অতএব রমযানে মাগফিরাতের দিকে আমাদের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে এই প্রেরণা বা স্পিরিটের প্রতি মনোযোগ রাখার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমত থেকে যদি স্থায়ী অংশ পেতে চাও তাহলে ইস্তেগফার কর, আল্লাহ্ তা'লার কাছে মাগফিরাত যাচনা কর। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যিনি এদিন গুলোতে নিজ বান্দাদের প্রতি খুবই সদয় হয়ে থাকেন, তাঁর করুণার উভয় ধারা প্রবাহমান রয়েছে। একটি হলো সাধারণ কল্যাণ ধারা যা থেকে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাই অংশ পায় আর একটি বিশেষ কল্যাণধারা যা শুধু সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা থেকেও যেন আমরা অংশ পেতে পারি। আর এক মু'মিন যেখানে এই কল্যাণধারা থেকে অংশ পাওয়ার জন্য যা সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পুণ্য করার শক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করবে সেখানে ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদা তা'লার আলো থেকে আলো নেয়া এবং খোদার শক্তি থেকে তার শক্তি অর্জন করা উচিত যেন কখনও সে খোদার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু না খায় বা খোদা তা'লার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে পতিত না হয়। কেননা খোদার শক্তি যদি সাথে না থাকে তাহলে শয়তানের আক্রমন বড় ভয়াবহ। তা তাৎক্ষণিকভাবে মানুষকে করতলগত করে ফেলে। তাই ইস্তেগফার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেন মানুষ খোদার শক্তি থেকে শক্তি লাভ করে এবং শয়তানের কাছ থেকে সব সময় নিরাপদ থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল আর এই দুর্বলতা এড়িয়ে খোদার শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার জন্য ইস্তেগফার আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এবং খোদার কৃপা ও রহমতকে নিজের জীবনে স্থায়ী করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাপোর্ট বা সমর্থন প্রয়োজন। এটি ছাড়া আমরা কিছুই করতে সক্ষম নই আর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নাম কাইয়্যুম রেখে তাঁর বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এই নেকী অব্যাহত রাখার জন্য এবং খোদা তা'লার করুণা ও ক্ষমা থেকে স্থায়ীভাবে অংশ পাওয়ার জন্য খোদা তা'লার সাহায্য এবং তাঁর সাপোর্টের প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম কাইয়্যুমই বলছে, কোন কিছুকে যদি স্থায়ী রূপ দিতে হয় তাহলে তোমাদের আমার সাপোর্ট এবং সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে, আমার দিকে এসো। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অতএব এই সাপোর্টকে কখনও ছেড়ে দিও না যা চিরস্থায়ী অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে— যিনি চিরস্থায়ী এবং স্থিতিদাতা আর সবচেয়ে দৃঢ় সাপোর্ট বা সমর্থন।

অতএব আমাদের একথা বুঝতে হবে, মধ্যবর্তী দশকের মাগফিরাতের আশারা হওয়ার অর্থ এটি নয় যে, এই দশ দিনে যত পার ইস্তেগফার করে নাও আর এভাবে তোমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাবে বরং মহানবী (সা.) এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, রমযান এসেছে, খোদা তা'লা নিজ বান্দাদের নিকটবর্তী হয়েছেন। তোমাদের মনোযোগও দোয়া এবং রোযার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে তাই এখন নিজেদের নেকী বা পুণ্যকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য,

আল্লাহ্ তা'লার রহমত এবং করুণা সিন্ধু থেকে স্থায়ীভাবে অংশ লাভের জন্য, নিজেদের প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য খোদা তা'লার দরবারে ইস্তেগফারের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনিতে আশ্রয় নাও আর চেষ্টা কর যেন এই অবস্থা চিরস্থায়ী হয়। আমি আশা করি, আমাদের অধিকাংশ এই চেতনার সাথে খোদার মাগফিরাত যাচনার মাধ্যমে দ্বিতীয় আশারা বা দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করেছেন; দ্বিতীয় আশারা যেহেতু সমাপ্ত তাই এখন এই চেতনা নিয়ে তৃতীয় আশারায় প্রবেশ করছেন বলে আশা রাখি যে, আল্লাহ্ তা'লা থেকে প্রাপ্ত আলো এবং শক্তি আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টির জান্নাতে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

মহানবী (সা.) বলেছেন, শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশারা, এসময় মানুষ খোদার রহমতের চাদরে আবৃত হয়, তাঁর আলো থেকে অংশ নিয়ে তাঁর শক্তির বলে যখন এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জানা কথা যে, সে খোদার নৈকট্য অর্জনকারীই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদান শূন্য রাখেন না। তিনি বড়ই দয়ালু এবং অনেক বড় দাতা। মানুষ যখন খোদার সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করে বা নেককর্মের চেষ্টা করে তখন খোদা তা'লা শুধু এতটুকুই বলেন না যে, ঠিক আছে আমি তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো না, তুমি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছ বরং জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশারা আখ্যা দিয়ে তিনি (সা.) সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে একথাই বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে স্বীয় জান্নাতের শুভ সংবাদ দেন। রমযান মাস আসার পর দোযখের দ্বার যে বন্ধ করা হয়েছিল যদি স্থায়ীভাবে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে থাক, ইস্তেগফার করতে থাক, পুণ্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য স্থায়ীভাবে যদি খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখ তাহলে জাহান্নামের দ্বার শুধু রমযানেই নয় বরং এই ত্রিশ দিনের ইবাদত, অঙ্গীকার আর অধিকার প্রদান আর তওবা ও ইস্তেগফারের স্থায়ী অভ্যাস জাহান্নামের দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেবে। জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন,

ধর্মের উদ্দেশ্য কি? ধর্মের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর উৎকর্ষ গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত ঈমান অর্জিত হয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভ করা আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধন রচিত হওয়া; কেননা সত্যিকার অর্থে সেটিই জান্নাত যা পরলোকে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাবে। আর সত্যিকার খোদা সম্পর্কে অনবহিত থাকা এবং সেই খোদা থেকে দূরে থাকা এবং তাঁর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা না রাখা এটিই সত্যিকার অর্থে জাহান্নাম যা পরলোকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাবে।

অতএব এই গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝতে হবে যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ধারাও এই পৃথিবীতেই সূচিত হয় আর জান্নাত লাভও এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায় আর এই উভয়টির যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যা বিভিন্ন অবস্থা এবং রূপে মানুষ লাভ করবে তা মূলত পরকালে হয়ে থাকে।

অতএব খোদা তা'লার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক, তওবা, ইস্তেগফার মানুষকে এই পৃথিবীতেই জান্নাতে ধন্য করে যার ব্যাপকতর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে পরকালে আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালবাসা, তাঁর করুণা এবং ক্ষমা প্রতিনিয়ত যাচনা না করা তাঁর আদেশ-নিষেধকে জেনেশুনে লঙ্ঘন করারই নামান্তর। এটি খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের বরাতে বিষয়টিকে এভাবে খোলাসা করেছেন, তিনি বলেন, কুরআন শরীফ জান্নাত এবং জাহান্নামের যে চিত্র তুলে ধরেছে অন্য কোন গ্রন্থ তা করেনি। এটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে যে, এ পৃথিবীতেই এই ধারার সূচনা হয় তাই তো বলা হয়েছে, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা ভেবে ভীত তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে অর্থাৎ একটি জান্নাত তো এই পৃথিবীতেই লাভ হয় কেননা খোদার ভয় এবং ভীতি তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে আর পাপ থেকে বিরত থাকলে জান্নাত লাভ হয়। আর পাপের দিকে ধাবিত হওয়া হৃদয়ে এক প্রকার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি সৃষ্টি করে যা নিজেই একটি ভয়াবহ জাহান্নাম। খোদা-ভীতি পাপ থেকে বিরত রাখে আর মানুষ যখন পাপ থেকে বিরত থাকে তখন সে এই পৃথিবীতেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পায় আর পাপের দিকে ধাবিত হওয়া তথা কোন পাপী কখনও শান্তি পায় না। কোন না কোন স্থানে তার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি লেগেই থাকে। আর পাপ করার পর মানুষের এই যে অবস্থা এটি স্বয়ং এক জাহান্নাম। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার ভয়ে ভীত থাকে, সে পাপ বর্জন করে এই আযাব এবং বেদনা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষা পায় যা রিপুর তাড়না এবং কামনা-বাসনার দাসত্বের ফলে সৃষ্টি হয়। যারা রিপুর তাড়না এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাসত্ব করে খোদা-ভীতি থাকলে তারা এগুলো এড়াতে পারে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, আর বিশ্বস্ততা এবং খোদার প্রতি ঝুঁকা এবং তাঁর সামনে বিনত হওয়ার ক্ষেত্রে তার উন্নতি হয়। আর মানুষ যখন এগুলো এড়িয়ে চলবে তখন খোদা তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার ক্ষেত্রে সে উন্নতি করবে যারফলে এক স্বাদ এবং প্রশান্তি সে লাভ করে আর এভাবে তার জন্য এ পৃথিবীতেই জান্নাতি জীবনের সূচনা হয়।

অতএব ইহলৌকিক জান্নাতী জীবন বা পরকালে জান্নাত লাভের প্রচেষ্টা এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া কি এবং কীভাবে সম্ভব? তিনি একথাই বলেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুসারে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করা শুধু পারলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এই পৃথিবীর বা ইহলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামও রয়েছে। আর এই জাহান্নাম থেকে তখনই রক্ষা পাওয়া সম্ভব যদি মানুষ খোদা তা'লাকে ভয় করে। আর যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে মহানবী (সা.) বলেছেন, সত্যিকার মুহসিন বা সৎকর্মশীল হলো সে যার মন-মস্তিষ্কে সব সময় এই ধারণা বিরাজমান থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন। আর যখন এই চেতনা থাকে যে, খোদা তা'লা আমাকে দেখছেন তখনই খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয় আর কেবল তবেই মানুষ পাপ এড়াতে সক্ষম হয়। আর যে পাপ বর্জনে

সক্ষম হয় সে হৃদয়ের উৎকণ্ঠা থেকেও রক্ষা পায়। যদি কোন ব্যক্তি চোর হয়ে থাকে বা যে কোন ভ্রান্ত বা ভুল কাজ করে তার সব সময় কোন না কোনভাবে এই আশংকা থাকে যে, কোথাও আমি ধরা না পড়ি বা কোন প্রকার দুর্নাম না হয়ে যায়।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আর এই ভয় তাকে এই পৃথিবীতেই জাহান্নামে বা দোযখে নিপতিত করে। সুতরাং যার খোদা-ভীতি আছে সে এই জগতেও এবং পরকালেও জান্নাত লাভ করে। আর যে রিপুর তাড়নার শিকার এবং কামনা-বাসনার দাসত্বে লিপ্ত সে এই পৃথিবীতেও আর পরকালেও জাহান্নামের ভাগী হয়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনই আসলে জান্নাত আর আল্লাহ্ থেকে দূরে যাওয়াই হলো জাহান্নাম। অতএব জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলা এবং খোদা-ভীতি আর খোদার তাক্বওয়াকে সবসময় দৃষ্টিগোচর রাখা।

অতএব এই সংক্ষিপ্ত হাদীসে তিনটি কথা উল্লেখ করে মহানবী (সা.) যেখানে খোদা তা'লার রহমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ইস্তেগফারের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর এরপর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, মানুষ যদি এটি অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে তাঁর প্রতিটি কথা এবং কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। রমযানের স্থায়ী কল্যাণ ধারা তার জীবনে প্রবাহিত হয় এবং তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয় এবং ইহ ও পরকালে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে সে তাঁর জান্নাতে ধন্য হয়।

অতএব এ কথা সর্বদা আমাদের সামনে রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ভাবতে হবে। রমযানের শেষ দশকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর ঈমানকে চিরকাল নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আরও একটি কথা এবং আরও একটি বিষয়ের প্রতিও মহানবী (সা.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বরং সুসংবাদ প্রদান করেছেন আর তাহলো, রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রমযানের রোযা রাখে তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে লায়লাতুল ক্বদরের রাতে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয় তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। লায়লাতুল ক্বদরের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু রমযানের রোযাও একই গুরুত্ব রাখে। ঠিক আছে যদিও এক রাতে পাপ ক্ষমা করা হয় কিন্তু অতীতের কর্মও সামনে থাকে আর রমযানের ত্রিশ দিনেও একই কাজ করতে হয় বা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এগুলো হলো সেই শর্ত যা আবশ্যকীয়। রমযানের রোযা রাখা এবং লায়লাতুল ক্বদর পাওয়া ও পাপের ক্ষমা লাভ করা, ঈমানী চেতনা এবং আত্মজিজ্ঞাসা এগুলো আবশ্যক। যদি রমযানের প্রথম দিনগুলোতে কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে শেষ দিনগুলোতে তা দূর করার চেষ্টা থাকা উচিত। মহানবী (সা.) শুধু এই কথা বলেন নি যে, শুধু তার পাপই ক্ষমা করা হবে যে লায়লাতুল ক্বদর লাভ করবে বরং প্রত্যেক

ব্যক্তি যে রোযা এবং লায়লাতুল ক্বদর ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে অতিক্রম করে তার আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে থাকেন। মু'মিনের অনেক বিশেষত্ব এবং মু'মিন সংক্রান্ত অনেক শর্তের কথা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা যেখানেই এই শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে অনেক জায়গায় ঈমানকে সৎকর্মের সাথে যুক্ত করেছেন। অতএব এদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ঈমান কাকে বলে? আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ঈমান এবং একই সাথে নেককর্ম বা সৎকর্মের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মু'মিনের অনেক চিহ্ন এবং লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। উদাহারণ স্বরূপ একটি লক্ষণ হলো, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ অর্থাৎ, মু'মিন কেবল তারাই যাদের সামনে যখন আল্লাহ্ তা'লার কথা উল্লেখ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভীত এবং ত্রস্ত হয়। কাজেই মু'মিনের পরিচয় হলো, সে যেন সব সময় এই চিন্তা-চেতনার মাঝে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুসারে জীবন যাপন করা আবশ্যক আর আল্লাহ্ তা'লাও এই নির্দেশ দিয়েছেন। যখনই আল্লাহ্ তা'লার বরাতে বা প্রেক্ষাপটে কোন কথা তাকে স্মরণ করানো হয় তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে ভীত হয় এবং সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করে। অতএব যখন বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'লার বরাতে সৎকর্ম করার এবং অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নির্দেশও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে রয়েছে এবং এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাই এগুলো সব সময় আমাদের দৃষ্টিতে রাখা প্রয়োজন। খোদা তা'লার বরাতে যখন বলা হয় যে, এগুলো পালন কর আর মানুষ তাসত্ত্বেও সেগুলো পালনের প্রতি মনোযোগ না দেয় তাহলে প্রশ্ন হলো, এই আয়াতের অধীনে সে কি মু'মিনদের শ্রেণীভুক্ত হয়? বা আমরা যদি মনোযোগ না দেই তাহলে আমরা কি মু'মিনদের জামাতভুক্ত? তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে এবং নিজ ঈমানের অবস্থা বিশ্লেষণ করে রোযা রাখে এবং লায়লাতুল ক্বদর অতিক্রম করে তাহলে তার পাপ ক্ষমা করা হবে।

অতএব রমযান এবং লায়লাতুল ক্বদরের কল্যাণ শর্ত সাপেক্ষ। যেমনটি আমি শুরুতেও বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী শর্ত সাপেক্ষ হয়ে থাকে। মানুষের ঈমানে যদি দুর্বলতা থাকে আর অন্যের অধিকার যদি সে পদদলিত করে তারপরও যদি সে লায়লাতুল ক্বদর দেখেছে বলে দাবী করে, যদি তার মাঝে দোয়ার বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়, জীবনে পূর্ণ বিপ্লব আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফযল এবং রহমত তাকে ধন্য করেছে। আর এর দাবী হলো, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা। যদি অবস্থা এমন না হয় তাহলে হতে পারে যাকে সে লায়লাতুল ক্বদর মনে করেছে সেটি এক আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি (আ.) বলেছেন, ঈমান পরিপূর্ণ হওয়া চাই এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনাও থাকা চাই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বিষয়টি আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন যে, শুধু সেই বিশেষ রাতই লায়লাতুল ক্বদর নয়। লায়লাতুল ক্বদরের তিনটি রূপ রয়েছে। একটি হলো সেই রাত যা রমযান মাসে আসে। একটি হলো, সেই যুগ যা নবীর যুগ হয়ে থাকে। আরেকটি হলো,

মানুষের জন্য বা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লায়লাতুল ক্বদর হলো সেটি যখন সে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, জাগতিক সকল নোংরামি এবং কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, নিজ ঈমানের ওপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে সকল পাপকে যখন সে ঝেড়ে ফেলে। অতএব এটিই সেই লায়লাতুল ক্বদর। যদি এটি লাভ হয় আর আমরা সম্পূর্ণভাবে যদি খোদার হয়ে যাই এবং তাঁর নির্দেশাবলী মান্যকারী হই, নিজেদের ইবাদতের মানের উন্নয়নকারী হয়ে যাই তাহলে এটি আমাদের সেই লক্ষ্য যা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যদি এই মর্যাদায় উপনীত হই বা এটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত আমাদের দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় বলে গণ্য হবে। আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকের মান্যকারী, আমাদের নিজেদের অবস্থায় বিপ্লব সাধন করে নিজেদের ঈমানকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন যেখানে আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হবে। আমরা আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা নিয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিতকারী হবো আর রমযানের কল্যাণ আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী হোক এ দোয়াই করি।

খোদা করুন আমাদের মাঝে অনেকেই সেই লায়লাতুল ক্বদরের অভিজ্ঞতা লাভ করুক যা দোয়া গৃহীত হওয়ার বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসে, যা সেই শেষ দিনগুলোতে আসে যার কথা মহানবী (সা.) আমাদেরকে অবহিত করেছেন। এটি পাওয়া আমাদেরকে যেন পুণ্য এবং তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত করে বরং এক্ষেত্রে যেন আমাদেরকে উন্নত করে। আমাদের অতীতের সকল পাপের যেন ক্ষমা লাভ হয় আর ভবিষ্যৎ পাপ বর্জনের জন্যও আল্লাহ্ তা'লা নিজ বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের মাঝে শক্তি এবং সামর্থ সৃষ্টি করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।